X ফাইল

দুর্নীতি দমন ব্যুরো

প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

দুর্নীতি দমন ব্যুরো কার্যত পরিণত হয়েছে ঠুঁটো জগন্নাথে। দুর্নীতি দমনে ব্যুরো কার্যকর কোনো অবদান রাখতে পারছে না। ব্যুরোর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় উত্থাপিত হচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগ, যা ব্যুরোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। দেখা গেছে, অতীতের সব সরকারই ব্যুরোকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। জানা গেছে, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বিলটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপিত হলে অনুমোদিত হয়। তবে আইন মন্ত্রণালয়ে বিলটি আবার পাঠানো হয়েছে। সরকারের একটি মহল স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া ভালোভাবে দেখছে না। একারণে চলছে পরিকল্পিত কালক্ষেপণ। চলতি সংসদ অধিবেশনেও বিলটি উত্থাপিত হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

গত এক যুগে তিনটি সরকারের আমলে দায়ের করা মন্ত্রী, সাংসদের বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা ঝুলে রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণের বিরুদ্ধে ব্যুরোর দায়ের করা তিন হাজার মামলা ঝুলে রয়েছে। বর্তমানে সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যুরো ৮৪টি মামলা দায়ের করেছে। আওয়ামী লীগ আমলে দায়ের করা বিগত বিএনপি সরকারের মন্ত্রী, এমপিদের মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হচ্ছে। নতুবা স্থগিত করে দেয়া হচ্ছে।

ব্যুরো কর্মকতাদের অভিযোগ, ব্যুরোর কার্যকলাপ সব সময় থাকে শৃঙ্খলিত। ব্যুরোকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। ভিআইপির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে লাগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন। পালা বদলের পর মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ায় অতীতের কাজ হয় পন্ডশ্রম। এ কারণে ব্যুরো কর্তকর্তারা মামলা পরিচালনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। দুর্নীতি দমন ব্যুরো কর্মকর্তাদের দাবি, ব্যুরোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার জন্য ঢেলে সাজানো হোক।

৬০ বছরে অর্জন শূন্যের কোঠায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে উপমহাদেশে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তৎকালীন রেশনিং ব্যবস্থায় ব্যাপকহারে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্যসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালের মজুত ও মুনাফা প্রতিরোধ অধ্যাদেশ জারি হয়। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের এ অংশ দুর্নীতি দমনের প্রথম প্রয়াস নেয়া হয়। তৎকালীন খাদ্য বিভাগের অধীনে ১৯৪৩ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য Enforcement Branch খোলা হয়। ঐ সময়ে এ শাখা সময়ের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেলে তা প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৪৭ সালের ১১ মার্চ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণীত হয়। এই আইন বলবৎ করার দায়িত্ব তৎকালীন সিআইডি Enforcement Branch-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালে উক্ত আইনের পরিপূরক পদ্ধতিগত আইন হিসেবে The Criminal Law Amendment প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং পুলিশ বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত না হওয়ার কারণে পৃথক একটি সংস্থা দ্বারা দুর্নীতি সংক্রান্ত সব অপরাধের তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান দুর্নীতি দমন ব্যুরো নামে একটি অস্থায়ী পরিদপ্তর গঠন করা হয়। একই সালের ১ এপ্রিল দুর্নীতি দমন আইন ১৯৫৭ প্রণীত হয়। ১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ এবং ঘোষিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধানের পরিধি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র

ছিল। ১৯৬২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো সমূহ (ডিএবি) পুলিশ সুপারের অধীনস্ত ছিল। ১ জুন, ১৯৬২ থেকে ব্যুরো পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোসমূহের দায়িত্ব জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত হয়। সেই সঙ্গে ডিএবি-কে তদারক করার জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক নিয়োগ করে বিভাগীয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর দুর্নীতি দমন সংস্থার ওপর দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এরপর সংস্থার সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত বেশকিছু পরিবর্তন হয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে কেন্দ্রীয় বিশেষ পুলিশের ওপর অর্পিত কার্যাবলীর বেশির ভাগ অংশ দুর্নীতি দমন সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৩ সালে বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এর সমুদয় দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পুরোপুরিভাবে দুর্নীতি দমন সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পদকে দুর্নীতি দমন সংস্থার সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত সংস্থাটিকে বিলুপ্ত করে এর সমুদয় দায়দায়িত্ব দুর্নীতি দমন সংস্থার কাছে অর্পণ করা হয়। উক্ত সংস্থার ৫০ ভাগ পদ দুর্নীতি দমন সংস্থায় একত্রীকরণ করা হয়।

১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দুর্নীতি দমন সংস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯৮৮ সালে বিভাগীয় দুর্নীতি দমন অফিসগুলোকে আঞ্চলিক অফিসে রূপান্তর করা হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি দমন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কখনও রাষ্ট্রপতির অধীনে আবার কখনও প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত ছিল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ১৯৯১ সাল থেক দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। যাত্রার ষাট বছরের মধ্যেও দুর্নীতি দমন ব্যুরো সত্যিকার স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। ৬০ বছরে মূলত প্রতিষ্ঠানটির অর্জন প্রায় শূন্যের কোঠায়। এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকার পরও দেশে ক্রমাগত দুর্নীতি বেড়েছে।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো : সরষের মধ্যেই ভূত

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কাজ দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। অভিযোগ রয়েছে, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়ে দুর্নীতিতে। এ যেন সরষের মধ্যেই ভূত। টিআই রির্পোর্টে দেখা যায়, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুসারে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ তারমধ্যে সালের মধ্যে ব্যুরোর ৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তিন জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বাকি ৩৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৫টির মতো অভিযোগ পেইন্ডিং রয়েছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে মামলা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়ীদ, খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীসহ প্রায় সব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যুরো মামলা দায়ের করেছে। দুই বছর আওয়ামী সরকারের মন্ত্রী, এমপিদের বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৪টি মামলার চার্জশিট হয়েছে। তবে সব মামলার আসামিরা এখন জামিনে রয়েছে

তবে ব্যুরো সূত্র জানিয়েছে গত পাঁচ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি। যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে, তারা হাইকোর্টে মামলা করে আবার ব্যুরোতে ফিরে এসেছে।

ব্যুরোর কাঠামো : স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে অন্তরায়

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। তিনি মূলত কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী ও তার কার্যালয়ের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে। তাকে সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্য কোনো সংবিধান পদধারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও মামলা রুজু করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। সরকারের যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের অনুমোদন

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ২ বছরে ৮৪টি মামলা

দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে গত দুই বছরে ১০৮টি মামলা দায়ের করেছে।

ইতিমধ্যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৬টি, সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে ১১টি, সাবেক টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোঃ নাসিমের বিরুদ্ধে ৪টি, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএসএম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে ৩টি, সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২টি, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেকের বিরুদ্ধে ৩টি, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমুর বিরুদ্ধে ২টিসহ সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাবেক বিদ্যুৎমন্ত্রী লেঃ জেনারেল নূরউদ্দিন খান, সাবেক পরিকলপনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ যাবৎ ৮৪টি মামলা রুজু করেছে।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো সূত্র জানিয়েছে, মামলাগুলোর ব্যাপক তদন্ত শেষে ইতিমধ্যে ৪৪টি মামলায় চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে। চার্জশিট দায়েরকৃত মামলা বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির কারণে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে তার মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু রয়েছেন। জানা গেছে, খুব শীঘ্রই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমুসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অন্যান্য ১৫টি মামলার তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল করা হবে।

লাগে। মহাপরিচালক শুধু অনুমোদন দিতে পারেন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিবের নিচে) পৌরসভা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শুধু মামলা করার অনুমোদন পেতেই ব্যুরোর দীর্ঘ সময় চলে যায়।

টিআইবি'র তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং পরবর্তী তদন্ত কাজ সম্পন্ন করতে বিভিন্ন কারণে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হচ্ছে, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের মঞ্জুরি প্রদানেও দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে। কতিপয় মামলার বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ব্যুরো কর্তৃক অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকারি মঞ্জুরির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে প্রায় ৪ থেকে ৯ বছর সময় লেগে গেছে। মঞ্জুরির জন্য পাঠানোর পর থেকে মঞ্জুরি প্রাপ্তি পর্যন্ত কত সময় লাগে তা দেখার জন্য টিআইবি সীমিতসংখ্যক যে পরিসংখ্যান পায় তাতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকারের মঞ্জুরির জন্য পাঠানোর পর মার্চ ২০০১ পর্যন্ত ৬টি কেসে ১ থেকে ৬ বছর সময় চলে গেছে। তখন পর্যন্ত ব্যুরো মঞ্জুরির জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্যুরো কর্তৃক কোনো বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান ও তদন্ত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকারের অনুমতি নেয়ার জন্য ৬ মাস সময়সীমার বিধান রয়েছে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে বেশিরভাগ মামলার আলামত নষ্ট হয়, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মামলাগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থাই নেয়া যায় না । ফলে দীর্ঘসূত্রতা অনেক সময় ন্যায়বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে থাকে। সরকারি মঞ্জুরি পাওয়ার পরও পাবলিক সার্ভেন্ট আসামিদের গ্রেপ্তার না করে পলাতক দেখিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর ফলে ফলে বিচার পর্বে আসামির গ্রেপ্তার বা আত্মসমর্পণের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হচ্ছে।

পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্যুরোতে জের ছাড়া মোট অভিযোগের সংখ্যা ৩১,৭৪৬টি, প্রতি

সিবিআই : ভারতের রাজনীতিবিদদের আতঙ্ক

ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি রোধে যে সংস্থাটি কাজ করছে তার নাম The Central Bureau of Investigation সংক্ষেপে। CBI। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Special Police Establishment (SPE) থেকে Central Bureau of Investigation (CBI)-এর রূপরেখা উৎপত্তি লাভ করে। এসপিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের যুদ্ধ ও সরবরাহ বিভাগের লেনদেনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত কেসের তদন্ত করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিজীবীদের ঘুষ ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৪৬ সালে Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act জারী করা হয়। ১৯৬৩ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনানুসারে ডিএসপিই হলো আজকের সিবিআই।

সিবিআই বর্তমানে দুটি উইংয়ের মাধ্যমে তিনটি বিষয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলো হলো দুর্নীতি দমন, স্পেশাল ক্রাইম এবং অর্থনৈতিক ক্রাইম। সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সরকারের অনুমিত বিভাগসমূহের চাকরিজীবীদের দুর্নীতির তদন্ত করছে। স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ অর্থনৈতিক ক্রাইম, যেমন : ব্যাংক জালিয়াতি, আর্থিক জালিয়াতি, আমদানি-রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অনিয়ম ইত্যাদি তদন্তের পাশাপাশি সন্ত্রাস, ডাকাতি, অপহরণ ঘটনাও তদন্ত করছে।

ভারতের সব রাজ্যেই General Offence Wing-এর কমপক্ষে একটি করে শাখা রয়েছে। এছাড়া দেশের চারটি মেট্রোপলিটন শহরে Economic Offence Wing-এর শাখা রয়েছে। সিবিআই এখন ভারতের রাজনীতিবিদ, চলচ্চিত্রের ব্যক্তিত্ব, মাফিয়া, গডফাদারদের আতঙ্ক।

সিবিআই-এর প্রধান হলেন পরিচালক। অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষ পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সুপার, ডেপুটি পুলিশ সুপার, পরিদর্শক, উপ-পরিদর্শক, উপ-সহকারী পরিদর্শক, প্রধান কনস্টেবল এবং কনস্টেবল। বিভিন্ন পদবির পুলিশের লোকবলের মোট সংখ্যা ৩৮৫৬। প্রশাসনিক স্টাফের সদস্য সংখ্যা ১২৩১। এছাড়া অন্যান্য ক্যাটাগরির মধ্যে ২৩০ জন আইন কর্মকর্তা ১৫৪ জন টেকনিক্যাল পদ, ১১৭ জন ফরেনসিক বিজ্ঞানী এবং ১৯৯ জনের গ্রুপ-ডি ও ক্যান্টিন স্টাফের অনুমোদিত পদ রয়েছে।

২০০১ জানুয়ারিতে সিবিআই ১১৭টি কেস রেজিস্টার করে। এই কেসগুলোতে ২০৮ জন পাবলিক সার্ভেন্টস জড়িত। এদের মধ্যে গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ১২৬ জন। এ সময় সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন বিভাগ ১৯টি ট্র্যাপ কেস রেজিস্টার করে। স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ কাস্টমসের একজন জয়েন্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে একজন যাত্রীর ১.৩৭ কোটি রুপির মোবাইল ফোন চোরাচালানে ক্লিয়ারেন্স দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার বিরুদ্ধে একটি কেস রেজিস্টার করে। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্রাইম বিভাগ ৪.৮৮ কোটি রুপি এবং ৮৭ লাখ রুপির অনিয়মের বিরুদ্ধে দুটি কেস রেজিস্টার করে। ৩১ জানুয়ারি ২০০১-এ ১৬৪১টি কেস তদন্তাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ২ বছর পূর্বের কেস হলো ৩৬১টি।

বছর গড়ে অভিযোগ এসেছে ৪৫৩৫টি করে। এই সময়ে পূর্ববর্তী বছরের জেরসহ মোট অভিযোগের সংখ্যা ৭০,২০১টি, গড়ে প্রতি বছর অভিযোগের সংখ্যা ১০,০২৮.৭১টি। জেরসহ অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তিকৃত হার ৪১% এবং পেইন্ডিংয়ের হার ৫৯%। অভিযোগগুলোর মধ্যে মাত্র ৯% থানায় মামলা রুজু করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩২% নথিভুক্ত করা হয়। এ সময়ে মামলাগুলোর মধ্যে প্রতিবছর গড়ে ১৮% অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত না হওয়ার কারণে প্রতিবছর গড়ে ৬% মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। তদন্ত এবং প্রক্রিয়াধীন অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রতিবছর গড়ে ৭৭%। দাখিলকৃত অভিযোগপত্রগুলোর মধ্যে আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে গড়ে মাত্র ৪৫৬টি করে বা ৯.২%। দাখিলকৃত অভিযোগপত্রগুলোর মধ্যে সাজা হয়েছে গড়ে ৪% এবং খালাস পেয়েছে ৫.২%। প্রতি বছর ৯০.৮% অভিযোগপত্র পরবর্তী বছরের জন্য পেইন্ডিং রয়ে গেছে। ব্যুরোর অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা রুজু, অভিযোগপত্র দাখিল, সাজা, খালাস এবং পেইন্ডিং সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। প্রতিবছর গড়ে সাজার হার এত কম যে অসৎ লোক সহজেই দুর্নীতি করতে উৎসাহ বোধ করে। তাদের মনে কোনো প্রকার ভয়ভীতি কাজ করে না।

জানা গেছে, ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন পদগুলোতে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। তারা নির্দিষ্ট সময়ের পর আবারও আগের জায়গায় ফিরে যায়। ফলে ব্যুরোর সুনাম ও দুর্নামের দায় তাদের বহন করতে হয় না। অভিযোগ রয়েছে, ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ পদে ক্যাডার প্রশাসনের লোক থাকায় তারা ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি তদন্ত করতে চায় না। রাজনৈতিক সুযোগ নিয়ে অনেক প্রশাসনিক ক্যাডার দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে আখের গোছানোর কাছে ব্যবহার করে। এ কারণে ব্যুরোর নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। কারণ তারা পদোন্নতি পাচ্ছে না।

অনুসন্ধান দেখা যায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়ের করা মামলাগুলো খুবই দুর্বল হয়। এতে তদন্তকারী কর্মকর্তার থাকে গাফিলতি। থাকে পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে তদন্ত কর্মকর্তার সমন্বয়হীনতা। অভিযোগ রয়েছে, পিপি ব্যুরোর দায়ের করা মামলা বিষয়ে গুরুত্ব কম দেন। কারণ ব্যুরোর মামলায় তারা কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। কখনও বা তিনি প্রভাবিত হন অভিযুক্তদের দ্বারা। জানা গেছে, দুর্নীতি মামলায় সাক্ষী পাওয়া যায় কম। মূলত এসব কারণে দুর্নীতি মামলার বিচার হয় না।

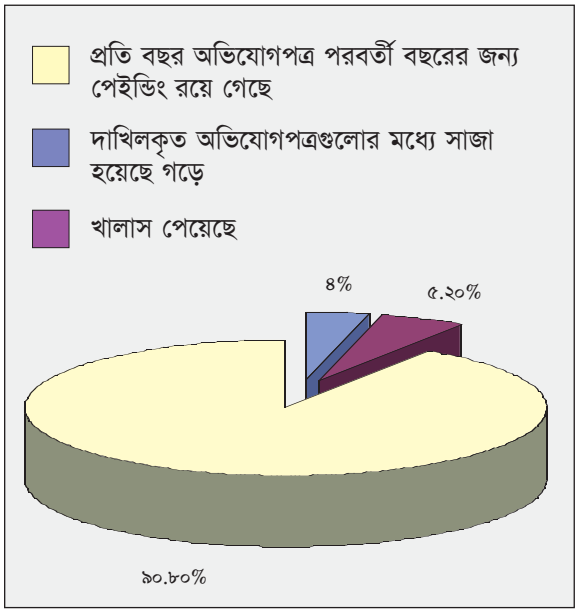

আইসিএসি : কাজ করছে স্বাধীনভাবে

সরকারি খাতে সততা প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল জনগণের। একটি দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করে নতুন সরকার নির্বাচিত হয় যাতে বিরোধী দলেরও সমর্থন ছিল। এ লক্ষ্যে তারা প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নকে প্রাধান্য দেন। আইন সভায় Independent Commission Against Corruption (ICAC)-এর প্রথম বিল নিয়ে অনেক বিতর্ক হয় এবং সংসদে বিতর্কের পর বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিলটি ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে সংসদ এবং গভর্নর অনুমোদন করেন। ১৯৮৮ সালের Independent Commission Against Corruption Act অনুসারে অস্ট্রেলিয়ায় Independent Commission Against Corruption প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৯ সালের মার্চ থেকে আইসিএসি-এর কার্যক্রম শুরু হয়। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর সময়ে সময়ে বেশ কিছু সংশোধন আনা হয়।

সঠিক তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্যই আইসিএসিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশের চেয়েও অধিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইন অনুসারে আইসিএসি-এর কমিশনার ৫ বছর তার দায়িত্ব পালন করবেন। তার কর্ম সময় নবায়ন করা হবে না। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান অথচ কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ১৯৯১ সাল থেক দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। যাত্রার ষাট বছরের মধ্যেও দুর্নীতি দমন ব্যুরো সত্যিকার স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। ৬০ বছরে মূলত প্রতিষ্ঠানটির অর্জন প্রায় শূন্যের কোঠায়

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্ত কর্মকর্তারা তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ পান না, তদন্তের জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ থাকে না। এ কারণে দেখা যায়, ব্যুরো কর্মকর্তা যার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছেন, তার সাহায্য নিতে হয়। ফলে নৈতিক কারণে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবেও ব্যুরোর কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত জনবল ১২৭১ জন। বর্তমানে কর্মরত ৯৬৮ জন। পরিদর্শক, এসআইএ, এমআই পদেও গড়ে প্রায় ৪০ টি করে পদ খালি রয়েছে। ব্যুরোর এখনও নিয়োগ দেয়া হয়নি জনসংযোগ কর্মকর্তাকে। ফলে জনগণের সঙ্গে ব্যুরোর কাজের সম্পর্ক রচিত হচ্ছে না। ব্যুরোর কর্মকর্তাদের দুর্নীতির চিহ্নিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞের অভাবে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

রাজনৈতিক মামলা : কর্মকর্তাদের পন্ডশ্রম

সরকার পরিবর্তনের পর দুর্নীতি দমন ব্যুরের মামলা করার হিড়িক পড়ে যায়। এরশাদ সরকারের পতনের পর ব্যুরো শুধু এরশাদের বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা দায়ের করে। তার মধ্যে একমাত্র জনতা টাওয়ার মামলায় এরশাদের শাস্তি হয়। বাকি মামলাগুলো এখন হিমাগারে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের ৫ বছরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, ছেলে তারেক রহমান, ভাই সাঈদ ইস্কান্দার, মন্ত্রী, সাংসদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে

৬০টি দুর্নীতির মামলা দায়ের হয়। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এয়ারবাসসহ ৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৪০টির মতো চার্জশিট সাবেক সরকারের আমলেই। এসব মামলাগুলো এখন কোনোটি প্রত্যাহার করা হয়েছে, কোনোটি আবার আদালতের নির্দেশে স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমান বিএনপিসহ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগের আমলে বিএনপির মন্ত্রী, এমপিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার শুরু হয়। ১৯৫৮ সালের দ্য ক্রিমিনাল 'ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের ১০(৪) ধারা অনুযায়ী বেশ কিছু মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল আজাদ, পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আমলে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোট মামলা ৪টি ছিল। তার বিরুদ্ধে এসব মামলায় অভিযোগের সময় তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান ছিলেন। অতিরিক্ত ভাতা উত্তোলন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রকল্পের ব্যয় অনিয়মের অভিযোগে চারটি মামলা দায়ের করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি এসব মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে মামলাগুলোর প্রসিকিউশন প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ ইস্কান্দারের বিরুদ্ধে ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত মামলাটির চার্জশিট দাখিল হয়েছিল আদালতে। সূত্রমতে, এই মামলাটির কার্যক্রম এখন আদালতে স্থগিত আছে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মার্শাল ডিস্টিলারির মামলাটি আদালতে কোয়াশমেন্ট হয়েছে। কোকো লঞ্চ সংক্রান্ত মামলাটিতে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী মীর শওকত আলীর বিরুদ্ধে ৩টি দুর্নীতির মামলার ১টিতে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। ১টি মামলায় আওয়ামী লীগের সময় চার্জশিট দেয়া হয়। ১টি মামলা এখন তদন্ত পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এয়ারবাস ক্রয়ে ১৮৭ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলাটি চার্জশিটের পর আদালতের নির্দেশে স্থগিত। বাড়ি সজ্জিতকরণ মামলাটি কোয়াশমেন্ট হয়েছে। মূলত আওয়ামী আমলে দায়ের করা সব মামলাই এখন ফাইলবন্দি। আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরই মূলত মামলাগুলোর গতি মন্থর হয়ে পড়ে। জানা গেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কোনো মামলাই হয়নি।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে মামলা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়ীদ, খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীসহ প্রায় সব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যুরো মামলা দায়ের করেছে। দুই বছর আওয়ামী সরকারের মন্ত্রী, এমপিদের বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৪টি মামলার চার্জশিট হয়েছে। তবে সব মামলার আসামিরা এখন জামিনে রয়েছে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের ৫ বছরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, ছেলে তারেক রহমান, ভাই সাঈদ ইস্কান্দার, মন্ত্রী, সাংসদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৬০টি দুর্নীতির মামলা দায়ের হয়। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এয়ারবাসসহ ৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৪০টির মতো চার্জশিট সাবেক সরকারের আমলেই। এসব মামলাগুলো এখন কোনোটি প্রত্যাহার করা হয়েছে, কোনোটি আবার আদালতের নির্দেশে স্থগিত করা হয়েছে

ডিএপি-২ সার কারখানা স্থাপনে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে আওয়ামী লীগ আমলের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে। তোফায়েল আহমেদ এ মামলা প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেছেন, 'মামলা করে আমাকে হেয় করা হয়েছে। দেশের স্বার্থে ডিএপি-২ সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়'। তিনি বলেন, 'মামলায় আমাকে আসামি করা হয়েছে। ইআরডির যে সচিব সমস্ত বিষয়টি তদারকি করলো, তাকে আসামি করা হল না'।

জানা গেছে, ব্যুরোর দায়ের করা সাবেক সচিব, যুগ্ম সচিব, সংসদ সদস্য, ভিআইপি পার্সনের বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা ঝুলে রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, একই অপরাধে জনপ্রতিনিধি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হলেও, সংশ্লিষ্ট সচিবকে ব্যুরো অদৃশ্য কারণে বাঁচিয়ে দেন। দেখা যায়, পুলিশের দুর্নীতি উদঘাটন ও মামলা দায়েরের ব্যাপারেও ব্যুরো নিষ্ক্রিয়। টিআই রিপোর্টে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের গম আত্মসাতের জন্যই ব্যুরো শতকরা ৮০ ভাগ মামলা দায়ের করেছে। বিষয়টি বেশ হাস্যকর।

প্রয়োজন : শক্তিশালী দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান

প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেয় ক্ষমতায় গিয়ে তারা দুর্নীতি দমন করবে। গঠন করবে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। ক্ষমতায় গিয়ে তারা ভুলতে বসে। জানা গেছে, জোট সরকার দাতা গোষ্ঠীর চাপে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনে সম্মত হয়। প্রক্রিয়া শুরু করে। আইন মন্ত্রণালয় স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের কাঠামো দাঁড় করায়। মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত হলে তা আবারও মন্ত্রণালয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। স্বাধীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো কাঠামো কেমন হচ্ছে তা নিয়ে মুখ খুলতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় রাজি নয়। ফলে সংশয় বাড়ছে। অনেকে বলছে, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটিকে আইনের ম্যারপ্যাঁচে ক্ষমতাসীনের আজ্ঞাবহ করেই রাখা হবে।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, দেশের দুর্নীতি কমাতে হলে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে। তাকে করতে হবে রাজনীতির প্রভাববলয় থেকে মুক্ত। নিরসন করতে হবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যুরোর কর্মকর্তাদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের। ব্যুরো কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের বিধান করতে হবে। তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ব্যুরোর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দিতে হবে প্রযুক্তিগত সহায়তা। ব্যুরোর নিজস্ব দুর্নীতি তদন্তের জন্য থাকতে পারে শক্তিশালী অপর একটি কমিশন। সর্বোপরি ব্যুরো কর্তৃক মামলা যাতে নিজস্ব গতিতে চলতে পারে তার জন্য নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

টিআই-এর সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। আগামীতে দেশ হ্যাটট্রিক চান্সে রয়েছে। এ কলঙ্ক থেকে প্রয়োজন আমাদের উত্তরণ। এ জন্য প্রয়োজন সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন শক্তিশালী একটি দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান।